أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 99) www.motaher21.net

الْحَمْدُ لِلَّه

" সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ।"

" All the praises and thanks.be to Allah."

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহরই জন্য।

সূরার নাম ও কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

সূরা আল-ফাতিহা-ই সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে। [তাবারী, কাশশাফ, আল-ইতকান] সর্বপ্রথম অহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি যে আয়াত বা সূরার অংশ নাযিল হয় তা হচ্ছে সূরা আল-আলাক'-এর প্রাথমিক আয়াত কয়টি। [দেখুন, বুখারী: ৩]

সূরা আল-মুদ্দাসসির-এর প্রাথমিক কতক আয়াত এর কিছুদিন পর নাযিল হয়। [বুখারী ৪৯২২, ৪৯২৪] কিন্তু এই খণ্ড আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার মধ্যে একটিও পূর্ণাঙ্গ সূরা ছিল না। পূর্ণাঙ্গ সূরা প্রথম যা নাযিল হয়েছে, তা হচ্ছে সূরা আল ফাতিহা।

কুরআন মজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে প্রত্যেকটির জন্য একটি নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই নামকরণ ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোন কোন সূরার নাম রাখা হয়েছে এর প্রথম শব্দ দ্বারা।

কোন সূরায় আলোচিত বিশেষ কোন কথা কিংবা তাতে উল্লেখিত বিশেষ কোন শব্দ নিয়ে তা-ই নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও বিষয়বস্তুকে সম্মুখে রেখে। কয়েকটি সূরার নাম রাখা হয়েছে কোন একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি খেয়াল রেখে। সূরা আল-ফাতিহার নাম রাখা হয়েছে কুরআনে এর স্থান-মর্যাদা, বিষয়বস্তু-ভাবধারা, এর প্রতিপাদ্য বিষয় ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে। এদিক দিয়ে সূরা আল-ফাতিহার স্থান সর্বোচ্চ। কেননা অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা আল-ফাতিহার নাম মাত্র একটি নয়, অনেকগুলো। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হচ্ছে, ১. 'ফাতিহাতুল কিতাব' (فَاتِحَةُ الْكِتَابِ) কুরআনের চাবি-কাঠি। কেননা, এই সূরা দ্বারাই কুরআনের সূচনা হয়, কুরআনের প্রথম স্থানেই একে রাখা হয়েছে। কুরআন খুলে সর্বপ্রথম এই সূরা-ই পাঠ করতে হয়। কখনও কখনও এই নামের রূপান্তর হয়ে ফাতিহাতুল কুরআন হয়ে থাকে। এতে অর্থের দিক দিয়ে কোন পার্থক্যই সুচিত হয় না। ২. "উম্মুল কিতাব" (أُمُّ الْكِتَابِ) আরবী ভাষায় 'উম্ম' বলা হয় সর্ব ব্যাপক ও কেন্দ্রীয় মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসকে। সৈন্য বাহিনীর ঝান্ডাকে বলা হয় উম্ম। কেননা সৈনিকবৃন্দ তারই ছায়াতলে সমবেত হয়ে থাকে। মক্কা নগরের আর এক নাম হচ্ছে, 'উম্মুল কুরা'-'জনপদসমূহের মা'। কেননা, হজ্জের মৌসুমে সমস্ত মানুষ-সকল গোত্র ও জাতি এই শহরেই একত্রিত হয়। ইমাম বুখারী কিতাবুত তাফসীর-এর শুরুতে লিখেছেনঃ এর নাম 'উম্মুল কিতাব' এজন্য বলা হয়েছে যে, কুরআন লিখতে ও পড়তে তা-ই প্রথম এবং সালাতের কেরাতেও তা-ই প্রথম পাঠ করতে হয়। ৩. "সূরাতুল-হামদ" (سُوْرَةُ الْحَمْد) তা'রীফ ও প্রশংসার সূরা। হামদ এই সূরার প্রথম শব্দ। ইহাতে আল্লাহ্‌র হামদ-তা'রীফ-প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে, সেই জন্য এটি এ সূরার জন্য যথার্থ নাম। ৪. "সূরাতুস-সালাত" (سُوْرَةُ الصَّلَاةِ) - অর্থাৎ সালাতের সূরা। যেহেতু সব সালাতের সব রাক"আতেই এটি পাঠ করতে হয় সেজন্যই এই নামকরণ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

(لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সালাত হবে না।' [বুখারীঃ ৭৫৬, মুসলিমঃ ৩৯৪] ৫. "আস্-সাব'য়ুল মাসানী" (السَّبْعُ الْمَثَانِىْ)—'বার বার পাঠ করার সাতটি আয়াত'। সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত রয়েছে এবং তা বার বার পাঠ করা হয় বলে এর আর এক নাম সাব'য়ুল মাসানী'। অথবা সালাতের প্রতি রাক'আতেই তা পড়া হয় বলেই এর এই নাম। [আল-কাশশাফ, বাগভী, তাফসীর ইবন কাসীর, আল-ইতকান, আত-তাফসীরুস সহীহ]

আয়াত সংখ্যা :

এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই যে, সূরা ফাতিহার মোট সাতটি আয়াত রয়েছে। এ জন্য হাদীস শরীফে একে সাতটি পুনরাবৃত্তিমূলক আয়াতের সূরা (السَّبْعُ الْمَثَانِىْ) বলা হয়েছে। [বুখারী ৪৭০৩] পবিত্র কুরআনেও একে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। [সূরা আল-হিজর:৮৭]

এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছেঃ সূরার পূর্বে যে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" উল্লেখিত হয়েছে তা সূরা ফাতিহার মধ্যে গণ্য আয়াত ও এর অংশ, না তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন জিনিস? এর উত্তরে বলা

যায়, কোন কোন সাহাবী “বিসমিল্লাহ"কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করতেন। পক্ষান্তরে অপর সাহাবীদের মতে এটি এ সূরার অংশ নয়। তবে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত কুরআনে এটিকে সূরা আল-ফাতিহার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ কেরাআতেও এটিকে সূরার প্রথমে একটি আয়াত ধরা হয়েছে এবং ‘সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা ‘আলাইহিম গাইরিল মাগদূবি ‘আলাইহিম ওলাদ দ্বলীন’ পর্যন্ত পুরোটাকে একই আয়াত ধরা হয়েছে। আর যারা বিসমিল্লাহকে সূরার আয়াত হিসেবে গণ্য করেননি তারা

(صِراطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)

পর্যন্ত এক আয়াত, আর তার পরের অংশ

(غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ)

কে আলাদা আয়াত সাব্যস্ত করে সাত আয়াত পূর্ণ করেছেন। [বাগভী]

নাযিল হওয়ার স্থানঃ

গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে যে, সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কারও মতে এটা একবার মক্কায় এবং আর একবার মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া এর অর্ধেক মক্কায় এবং অপর অর্ধেক মদীনায় নাযিল হয়েছে বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ সব মত গ্রহণযোগ্য নয়। তার বড় প্রমাণ এই যে, সূরা আল-হিজর সর্বসম্মতভাবে মক্কী। তার ৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ “আমরা আপনাকে সাতটি বার বার পঠনীয় আয়াত ও কুরআনে ‘আযীম প্রদান করেছি।’ এই বার বার পঠনীয় সাতটি আয়াতই হল সূরা আল-ফাতিহা। [বাগভী] তাছাড়া সালাত মক্কায়ই ফরয হয়েছিল এবং সূরা ফাতিহা ছাড়া কখনই সালাত পড়া হয়নি- এটাও সর্বসম্মত কথা।

সূরার ফযীলতঃ

সূরা আল-ফাতিহার ফযীলত বর্ণনায় অসংখ্য হাদীস এসেছে। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন, আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সালাতকে আমি দু’ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। বান্দা (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) বললে আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে; আর যখন সে (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) বলে তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ-গান করেছে। আর যখন সে বলে (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে। আর যখন সে বলে

(اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ)

তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। আর যখন সে বলে

(اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ)

তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়"। [মুসলিম,৩৯৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মুল কুরআন এর অনুরূপ কোন কিছু তাওরাত ও ইঞ্জীলে নাযিল করেননি। আর তা হলো পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত, যা আমি (আল্লাহ্) এবং বান্দাদের মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত। " [নাসায়ী, ৯১৩, তিরমিযী, ৩১২৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরিল 'আলাইহিস্সালাম উপবিষ্ট ছিলেন। তখন হঠাৎ উপরের দিকে (এক ধরণের) শব্দ শুনা গেল। তখন জিবরিল 'আলাইহিস সালাম আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, এটা আকাশের একটি দরজা যা কখনও খোলা হয় নি। ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, অতঃপর সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে দু'টি নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি যা আপনাকে দেয়া হয়েছে, যা আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-বাকারাহ এর শেষাংশ। এর একটি অক্ষর পাঠের মাধ্যমে চাওয়া বস্তুও তাকে দেয়া হবে। [মুসলিম: ৮০৬]

অনুরূপভাবে আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে এক জায়গায় অবতরণ করলাম। সেখানে একটি মেয়ে এসে বলল, এ গ্রামের প্রধানকে সাপে দংশন করেছে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঝাঁড়-ফুঁক করার মত আছে? তখন মেয়েটির সাথে এক ব্যক্তি গিয়ে তাকে ঝাঁড়-ফুঁক করে এল, আমরা তাকে ঝাঁড়-ফুঁক জানে বলে মনে করতাম না। এতে গ্রাম প্রধান আরোগ্য লাভ করেন। ফলে সে তাকে ত্রিশটি বকরী উপহার দিল এবং আমাদেরকে দুধ পান করাল। আমাদের সঙ্গীকে আমরা বললাম তুমি কি ভাল ঝাঁড়-ফুঁক করতে জান? সে বলল, আমি শুধু উম্মুল কুরআন দ্বারা ফুঁক দিয়েছি। আমরা সবাইকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তোমরা এগুলোকে কিছু কর না। অতঃপর মদীনা পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, সে কিভাবে জানলো যে, এটি একটি ঝাঁড়-ফুঁক করার বস্তু! তোমরা এগুলো বন্টন করে নাও এবং আমাকে তোমাদের সাথে এক ভাগ দিও। [মুসলিম: ২২০১]

অন্য বর্ণনায় আবু সা'য়ীদ ইবনুল মু'আল্লা বলেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি সালাত শেষ করেই তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, "আমার কাছে আসা হতে তোমাকে কিসে বারণ করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা কি বলেন নি যে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন তোমাদেরকে ডাকেন সে বস্তুর দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মসজিদ হতে বের হবার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দিব। ... অতঃপর তিনি বললেন, তাহলো, (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ)। এটি হলো সাতটি পূনঃ পূনঃ পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে। [বুখারী, ৪৬৪৭]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সূরাটি সবচেয়ে মহান সূরা।

[১] সাধারণত আয়াতের অনুবাদে বলা হয়ে থাকে, পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। এ অনুবাদ বিশুদ্ধ হলেও এর মাধ্যমে এ আয়াতখানির পূর্ণভাব প্রকাশিত হয় না। কারণ, আয়াতটি আরও বিস্তারিত বর্ণনার দাবী রাখে। প্রথমে লক্ষণীয় যে, আয়াতে আল্লাহ্‌র নিজস্ব গুণবাচক নামসমূহের মধ্য হতে 'আর-রাহমান ও আর-রাহীম' এ দু'টি নামই এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। 'রহম' শব্দের অর্থ হচ্ছে দয়া, অনুগ্রহ। এই 'রহম' ধাতু হতেই 'রহমান' ও 'রহীম' শব্দদ্বয় নির্গত ও গঠিত হয়েছে। 'রহমান' শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র এমন একটি গুণবাচক নাম যা অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। [তাবারী] কুরআন ও হাদীসে এমনকি আরবদের সাহিত্যেও এটি আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। পক্ষান্তরে 'রহীম' শব্দটি আল্লাহ্‌র গুণ হলেও এটি অন্যান্য সৃষ্টজগতের কারও কারও গুণ হতে পারে। তবে আল্লাহ্‌র গুণ হলে সেটা যে অর্থে হবে অন্য কারও গুণ হলে সেটা সে একই অর্থে হতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রত্যেক সত্তা অনুসারে তার গুণাগুণ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এখানে একই স্থানে এ দুটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 'রহমান' হচ্ছেন এই দুনিয়ার ক্ষেত্রে, আর 'রাহীম' হচ্ছেন আখেরাতের হিসেবে। [বাগভী]

[২] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সর্বপ্রথম 'ইক্‌রা বিসমে' বা সূরা আল-'আলাক এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। এতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পাঠ শুরু করতে বলা হয়েছিল। সম্ভবত এজন্যই আল্লাহ্‌র এই প্রাথমিক আদেশ অনুযায়ী কুরআনের প্রত্যেক সূরা'র প্রথমেই তা স্থাপন করে সেটাকে রীতিমত পাঠ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার উপরিভাগে অর্থ ও বাহ্যিক আঙ্গিকতার দিক দিয়ে একটি স্বর্ণমুকুটের ন্যায় স্থাপিত রয়েছে। বিশেষ করে এর সাহায্যে প্রত্যেক দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করাও অতীব সহজ হয়েছে। হাদীসেও এসেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার শেষ তখনই বুঝতে পারতেন যখন বিসমিল্লাহ নাযিল করা হতো" [আবু দাউদ:৭৮৮]

তবে প্রত্যেক সূরার প্রথমে ও কুরআন পাঠের পূর্বে এ বাক্য পাঠ করার অর্থ শুধু এ নয় যে, এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে শুরু করার সংবাদ দেয়া হচ্ছে। বরং এর দ্বারা স্পষ্ট কণ্ঠে স্বীকার করা হয় যে, দুনিয়া জাহানের সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ্‌র তরফ হতে প্রাপ্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে এ কথাও মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন বিশেষ করে দ্বীন ও শরীয়াতের যে অপূর্ব ও অতুলনীয় নিয়ামত আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, তা আমাদের জন্মগত কোন অধিকারের ফল নয়। বরং তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিজস্ব বিশেষ মেহেরবানীর ফল।

তাছাড়া এই বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনাও করা হয় যে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁর কালামে-পাক বুঝবার ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করার তওফীক দান করেন। এ ছোট্ট বাক্যটির অন্তর্নিহিত ভাবধারা এটাই। তাই শুধু কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বেই নয় প্রত্যেক জায়েয কাজ আরম্ভ করার সময়ই এটি পাঠ করার জন্য ইসলামী শরীয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ প্রত্যেক কাজের পূর্বে এটি উচ্চারণ না করলে উহার মঙ্গলময় পরিণাম লাভে সমর্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিভিন্ন কথা ও কাজে এই কথাই ঘোষণা করেছেন। যেমন, তিনি প্রতিদিন সকাল-বিকাল বলতেন

(بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْئٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ)–

"আমি সে আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যার নামে শুরু করলে যমীন ও আসমানে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না, আর আল্লাহ্ তো সব কিছু শুনেন ও সবকিছু দেখেন।" [আবুদাউদ: ৫০৮৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬৯]

অনুরূপভাবে যখন তিনি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি লিখেন তাতে বিসমিল্লাহ্ লিখেছিলেন [বুখারী, ৭] তাছাড়া তিনি যে কোন ভাল কাজে বিসমিল্লাহ বলার জন্য নির্দেশ দিতেন। যেমন, খাবার খেতে, [বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম: ২০১৭, ২০২২]

দরজা বন্ধ করতে, আলো নিভাতে, পাত্র ঢাকতে, পান-পাত্র বন্ধ করতে [বুখারী ৩২৮০] কাপড় খুলতে [ইবনে মাজাহ ২৯৭, তিরমিযী ৬০৬] স্ত্রী সহবাসের পূর্বে বুখারী: ৬৩৮৮, মুসলিম: ১৪৩৪], ঘুমানোর সময় আবু দাউদ: ৫০৫৪] ঘর থেকে বের হতে [আবুদাউদ: ৫০৯৫] চুক্তিপত্র/ বেচা-কেনা লিখার সময় [সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৩২৮] চলার সময় হোঁচট খেলে [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৫৯] বাহনে উঠতে [আবু দাউদ: ২৬০২] মসজিদে ঢুকতে [ইবনে মাজাহ: ৭৭১, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৮৩] বাথরুমে প্রবেশ করতে [ইবনে আবি শাইবাহ: ১/১১] হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে [সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৭৯] যুদ্ধ শুরু করার সময় [তিরমিযী: ১৭১৫] শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ব্যাথা পেলে বা কেটে গেলে নাসায়ী: ৩১৪৯] ব্যাথার স্থানে ঝাড়-ফুক দিতে [মুসলিম: ২২০২] মৃতকে কবরে দিতে [তিরমিযী: ১০৪৬]। এ ব্যাপারে আরও বহু সহীহ হাদীস এসেছে। আবার কোথাও কোথাও 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিবও বটে যেমন, যবাই করতে [বুখারী: ৯৮৫, মুসলিম: ১৯৬০]

যেহেতু মানুষের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সে যে কাজই শুরু করুক না কেন, তা যে সে নিজে আশানুরূপে সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এমতাবস্থায় সে যদি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কাজ শুরু করে এবং আল্লাহ্‌র অসীম দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি হৃদয়-মনে অকুণ্ঠ বিশ্বাস জাগরুক রেখে তাঁর রহমত কামনা করে, তবে এর অর্থ এ-ই হয় যে, সংশ্লিষ্ট কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সে নিজের ক্ষমতা যোগ্যতা ও তদবীর অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহের উপরই অধিক নির্ভর ও ভরসা করে এবং তা লাভ করার জন্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে ।

“ফাতিহা’ শব্দের অর্থ এবং এর বিভিন্ন নাম

এ সুরাহ টির নাম ‘সূরাহ্‌ আল ফাতিহা। কোন কিছু আরম্ভ করার নাম ‘ফাতিহা’ বা উদ্ঘাটিকা। কুর’আনুল কারীমের প্রথমে এই সূরাহ্‌ টি লিখিত হয়েছে বলে একে ‘সূরাহ্‌ আল ফাতিহা বলা হয়। তাছাড়া সালাতের মধ্যে এর দ্বারাই কিরা’আত আরম্ভ করা হয় বলেও একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। উম্মুল কিতাবও এর অপর একটি নাম। জামহূর বা অধিকাংশ ইমামগণ এ মতই পোষণ করে থাকেন। তবে হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইবনু সীরীন (রহঃ) এ কথা স্বীকার করেন না। তাদের মতে লাওহে মাহফূয বা সুরক্ষিত ফলকের নামও উম্মুল কিতাব। হাসান বাসরী (রহঃ) এটাও বলেন যে, আয়াতুল মুহকামাত বা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট আয়াতগুলোই উম্মুল কিতাব।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِى والقرآن العظيم.

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এই সূরাহ টি হলো উম্মুক্ত কুর’আন, উম্মুল কিতাব, সাব‘আ মাসানী এবং কুর’আনুল ‘আযীম। (হাদীস সহীহ। জামি‘ তিরমিযী ৫/৩১২৪, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবূ দাউদ ২/ ১৪৫৮, দারিমী ২/৪৪৬, মুসনাদ আহমাদ ২/৪৪৮, সনদ সহীহ) এই সুরাহ টির নাম ‘সূরাহতুল হামদ’ এবং সূরাতুস সালাতও বটে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ “আমি সালাতকে অর্থাৎ সূরাহ্‌ ফাতিহাকে আমার মধ্যে এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি। যখন বান্দা বলে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।” (সহীহ মুসলিম ১/৩৮, ২৯২, জামি‘ তিরমিযী ১/২৯৫৩, নাসাঈ ২/৪৭৩, হাঃ ৯০৮, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১/৩৯, ৮৪, মুসনাদ আহমাদ ২/২৪১, ২৮৫,৪৬০, বায়হাক্বী ২/৩৮, ১৬৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/২৫২, হাদীস ৫০২, তাফসীর তাবারী ১/১৪৫, হাদীস ২২১, ২২৪)। এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাহ্‌ ফাতিহার নাম সূরাহ্‌ সালাতও

বটে। কেননা এই সূরাহ টি সালাতের মধ্যে পাঠ করা আবশ্যক রয়েছে। এই সূরার আরেকটি নাম সূরাহতুশ্ শিফা।

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন যে, সূরাতুল ফাতিহা প্রত্যেক বিশ ক্রিয়ায় আরোগ্যদানকারী। (হাদীস য'ঈফ। মুসনাদুল ফিরদাউস ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৭, হাদীস ৪২৬৪, বায়হাক্বী ফি শু'আবিল ঈমান ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৫০, হাদীস ২৩৬৮, দারিমী ২/৪৪৫, য'ঈফুল জামি' ৩৯৫৪,৩৯৫৫)। এর আরেকটি নাম 'সূরাহতুর রুকিয়্যাহ। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) সাপে কাটা রুগীর ওপর ফুঁ দিলে সে ভালো হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

'এটা যে রুকিয়্যাহ অর্থাৎ পড়ে ফুঁক দেয়ার সূরাহ্ তা তুমি কেমন করে জানলে? (ফাতহুল বারী ৪/৫২৯। সহীহুল বুখারী হাঃ ২২৭৬, ৫০০৭, ৫৭৩৬, ৫৭৪৯, সহীহ মুসলিম ৩৯/২৩, হাঃ ২২০১, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১১৩৯৯, আ.প্র. হাঃ ২১১৫, ই.ফা. হাঃ ২১৩২)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এ সূরাহকে 'আসাসুল কুর'আন' অর্থাৎ কুর'আনের মূল বা ভিত্তি বলতেন। আর এই সূরার ভিত্তি হলো بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ।

সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ (রাঃ) বলেন যে, এই সূরার নাম ওয়াফিয়াহ। আর ইয়াহ্ইয়াহ ইবনু কাসীর বলেন, এর নাম কাফিয়াও বটে। কেননা এটা অন্যান্য সূরাহকে বাদ দিয়েও একাই যথেষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু এটাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরাহ যথেষ্ট হয় না। কতিপয় মুরসাল হাদীসেও বর্ণিত আছে যে, উম্মুল কুর'আন সবারই স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সূরাহ গুলো উম্মুল কুর'আনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। অত্র সূরাহ কে সূরাতুস সালাত এবং সূরাতুল কানজও বলা হয়েছে।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবুল 'আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এই সূরাহ টি মাক্কী। কেননা এক আয়াতে আছেঃ ﴿وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ﴾

"আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুর'আন।" (সূরা হিজর, আয়াত নং ৮৭) আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

কুরতুবী (রহঃ) আবু লাইস সমারকান্দী (রহঃ)-এর একটি অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, এই সূরাহটির প্রথমাংশ মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর শেষ অর্ধাংশ মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় এ কথাটিও সম্পূর্ণ গারীব বা দুর্বল।

সূরাহ্ ফাতিহায় আয়াত, শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা

এ সূরার আয়াত সম্পর্কে সবাই একমত যে এগুলো ৭টি। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ এ সূরাহ টির পৃথক আয়াত কি-না তাতে মতভেদ রয়েছে। সকল কারী, সাহাবী (রাঃ) এবং তাবি'ঈ (রহঃ)-এর একটি বিরাট দল এবং পরবর্তী যুগের অনেক বয়োবৃদ্ধ 'আলিমে দ্বীন একে সূরাহ্ ফাতিহার প্রথম ও পূর্ণ একটি পৃথক আয়াত বলে থাকেন। কেউ কেউ একে সূরাহ ফাতিহারই অংশ বলে মনে করেন। আর কেউ কেউ একে এর প্রথমে মানতে বা স্বীকার করতেই চান না। যেমন মাদীনার ক্বারী ও ফাক্বীহগণ থেকেই এমন মত পরিলক্ষিত হয়। মহান আল্লাহ চাহেতো এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

এই সূরাহ টির শব্দ হলো পঁচিশটি এবং অক্ষর হলো একশ তেরোটি।

সূরাহ্ ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলার কারণ

ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহুল বুখারীর 'কিতাবুত্ তাফসীরে' লিখেছেনঃ 'এই সূরাহ টির নাম উম্মুল কিতাব' রাখার কারণ এই যে, কুর'আন মাজীদের লিখন এ সূরাহ্ থেকেই আরম্ভ হয়ে থাকে এবং সালাতের কিরা'আতও এ সূরাহ থেকেই শুরু হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৬। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এটা আবূ 'উবায়দাহ <-এর উক্তি, যা তিনি مجاز القرآن এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন)

একটি অভিমত এও আছে যে, যেহেতু পূর্ণ কুর'আনুল কারীমের বিষয়াবলী সংক্ষিপ্তভাবে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেহেতু এর নাম উম্মুল কিতাব হয়েছে। ইবনু জারীর (রহঃ) বলেনঃ 'আরব দেশের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে যে, তারা একটি ব্যাপক কাজ বা কাজের মূলকে এর অধীনস্থ শাখাগুলোর 'উম্ম বা 'মা' বলে থাকে। যেমন أُمُّ الرَّاسِ তারা ঐ চামড়াকে বলে যা সম্পূর্ণ মাথাকে ঘিরে রয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর পতাকাকেও তারা أُمُّ বলে থাকে, যার নীচে জনগণ একত্রিত হয়। মাক্কাকেও উম্মুল কুরা বলার কারণ এই যে, ওটাই সারা বিশ্ব জাহানের প্রথম ঘর বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর সেখান থেকেই ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করেছে। (তাফসীর তাবারী ১/১০৭) নামযের কির'আত এটা থেকেই শুরু হয় এবং সাহাবীগণ কুর'আনুল কারীম লেখার সময় এ সূরাহকেই প্রথমে লেখেছিলেন বিধায় একে ফাতিহাও বলা হয়। এ সূরার আরেকটি সঠিক নাম হলো 'সাব'আ মাসানী'। কেননা এটা সালাতের মধ্যে বারবার পড়া হয়। মাসানীর অন্যান্য অর্থ আল্লাহ চাহেতো যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উম্মুল কুরা সম্পর্কে বলেছেনঃ 'এটাই 'উম্মুল কুর'আন' এটাই 'সাব'আ' মাসানী এবং এটাই কুর'আনুল 'আযীম।' (মুসনাদ আহমাদ ২/৪৪৮, হাদীস সহীহ) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'এটাই' 'উম্মুল কুর'আন' 'ফাতিহাতুল কিতাব' এবং এটাই 'সাব'আ মাসানী'। (তাফসীর তাবারী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৮৯, হাদীস নং ১৩৪, হাদীস সহীহ)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ সাত আয়াত বিশিষ্ট, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এই সাত আয়াতের একটি অন্যতম আয়াত। আর তা হলো সাব‘আ মাসানী, কুর’আনুল ‘আযীম, এবং তা উম্মুল কিতাব ও ফাতিহাতুল কিতাব। অবশ্য এ হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী (রহঃ)ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে মারফূ‘ রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত। (দারাকুতনী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৬, হাদীস নং ৩১২, নাসবুর রায়াহ ১/৩৪৩, হাদীস সহীহ) ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ‘আলী, ইবনু ‘আব্বাস ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা সবাই সাবা‘আ মাসানীর ব্যাখ্যা ফাতিহা দ্বারা করেছেন আর বলেছেন যে, ‘বিসমিল্লাহ’ সাত আয়াতের সপ্তম আয়াত। আর এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ‘বিসমিল্লাহ’ অধ্যায়ে অচিরেই আসবে।

আ‘মাশ (রহঃ) ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, ইবনু মাস‘উদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কেন আপনার মাসহাফে তথা সহীফায় ফাতিহা লেখেন না। উত্তরে তিনি বললেন, যদি আমি তা লিখতাম, তাহলে প্রত্যেক সূরার শুরুতেই লিখতাম। আবূ বাকর ইবনু দাউদ (রহঃ) বলেন, যেমন সালাতে পড়া হয়। তিনি বলেন আমি মুসলিমগণ লেখা অপেক্ষা তা মুখস্থ রাখাকেই যথেষ্ট মনে করি।

সর্বপ্রথম অবতারিত সূরাহ কোনটি

সর্বপ্রথম সূরাহ্ কোনটি এ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, (১) সূরাহ ফাতিহা হলো সর্বপ্রথম অবতারিত সূরাহ। যেমনটি ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ‘দালায়িলুন নাবুওয়্যাত’ এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। আর ‘বাকিল্লানী’ (রহঃ)-এর ও তিনটি উক্তির একটি উক্তি এরূপই।

(২) কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম অবতারিত সূরাহ হচ্ছে, يا ايها المدثر যেমনটি জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে সহীহুল বুখারী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আবার (৩) কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম অবতারিত সূরাহ হচ্ছে, اقرأ باسم ربك الذي خلق। (সুনান বায়হাকী, ‘দালায়িলুন নাবুওয়াত’ ৭/১৪৪, তাফসীর তাবারী, ১/৯৪) আর এই সর্বশেষ উক্তিটিই সঠিক। যথাস্থানে এসম্পর্কে অচিরেই বিশদ বিবরণ আসবে। মহান আল্লাহই উত্তম সাহায্যস্থল।

সূরাহ্ ফাতিহার গুরুত্ব ও ফাযীলত

মুসনাদ আহমাদে আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ ‘আমি সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডাক দিলেন, আমি কোন উত্তর দিলাম না। সালাত শেষ করে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ এতোক্ষণ তুমি কি কাজ করছিলে?’ আমি বললামঃ ‘হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি সালাত আদায় করছিলাম।’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার এই নির্দেশ কি তুমি শোনোনি?

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَا﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারের দিকে আহ্বান করেন।” (৮ নং সূরাহ্ আনফাল, আয়াত নং ২৪) মাসজিদ থেকে যাওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুর’আনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরাহ্ কোনটি। তারপর তিনি আমার হাত ধরে মাসজিদ থেকে চলে যাবার ইচ্ছা করলে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেনঃ ‘ঐ সূরাহ টি হলো ‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন’। এটাই সাব‘আ মাসানী এবং এটাই কুর’আনুল ‘আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (সহীহুল বুখারী, হাঃ ৪২০৪, ৪৪২৬, ৪৭২০, মুসনাদ আহমাদ ৪/২১১, ১৫৭৩, ১৫৭৬৮, ১৭৮৫১, ১৭৮৮৪, সুনান বায়হাকী ২১৩৮, সহীহ ইবনু খুযায়মা, ৮৬২, সুনান নাসাঈ, ২/৯১২, সুনান দারিমী, ২/৩৩৭১, হাদীস সহীহ) এভাবেই এই বর্ণনাটি সহীহুল বুখারী, সুনান আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং ইবনু মাজায়ও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ওয়াকিদী (রহঃ) এই ঘটনাটি উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-এর বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-কে ডাক দিলেন, তখন তিনি সালাতে মগ্ন ছিলেন। সালাত শেষে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-এর হাতে রেখে মাসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার ইচ্ছা যে, তুমি একটি সূরাহ জ্ঞাত না হয়ে মাসজিদ হতে বের হবে না। সূরাটি এমন যে, এর সমতুল্য কোন সূরাহ তাওরাত, ইনজীল এমন কি স্বয়ং কুর’আন মাজীদেও অবতীর্ন হয়নি। উবাই (রাঃ) বলেন, সূরাটি জানার বাসনায় আমি ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! যে সূরাটি জানাতে চেয়েছিলেন তা কোন সূরাহ? তিনি বললেন, তুমি সালাত আরম্ভ করার পর কিরূপে কির’আত পড়ো? উবাই বলেন, আমি সূরাহ ফাতিহা اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ হতে শেষ পর্যন্ত পড়ে শুনালাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটাই সেই সূরাহ যে সূরার কথা বলেছিলাম। এ সূরার নামই সাব‘আ মাসানী ও কুর’আনুল ‘আযীম, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং ২৭৫) অত্র হাদীসের বর্ণনা কারী আবূ সা‘ঈদ দ্বারা আবূ সা‘ঈদ ইবনু মু‘আল্লা উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি জামি‘উল উসূল প্রণেতা ইবনুল আসীর ও তার অনুসারীগণ মনে করেন। আবূ সা‘ঈদ ইবনুল মু‘আল্লা তিনি একজন আনসারী সাহাবী। তার বর্ণিত হাদীস মুত্তাসিল। আর অত্র হাদীসের বর্ণনা কারী আবূ সা‘ঈদ হলেন খুযা‘আ গোত্রের একজন কৃতদাস। তিনি যদি সরাসরি উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-এর নিকট শোনে না থাকেন তাহলে হবে মুনকাতি‘ বা বিচ্ছিন্ন সূত্র বিশিষ্ট। আর যদি শোনে থাকেন তাহলে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তানুযায়ী তা সহীহ হবে। সঠিকটি মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তবে হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদ আহমাদে আরো রয়েছে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-এর নিকট যান যখন তিনি সালাত আদায় করেছিলেন। তারপর তিনি বলেনঃ ‘হে উবাই (রাঃ)! এতে তিনি তাঁর ডাকের প্রতি মনোযোগ দেন, কিন্তু কোন উত্তর দেননি। আবার তিনি বলেনঃ ‘হে উবাই! তিনি বলেনঃ ‘আস্সালামু ‘আলাইকা।’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বললেনঃ 'ওয়া 'আলাইকাস সালাম।' তারপর বলেনঃ 'হে উবাই! আমি তোমাকে ডাক দিলে উত্তর দাওনি কেন?' তিনি বলেনঃ 'হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি সালাত আদায় করছিলাম।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন উপর্যুক্ত আয়াতটিই পাঠ করে বলেনঃ

তুমি কি يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ এই আয়াতটি শুনোনি?

তিনি বলেনঃ 'হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! হ্যাঁ আমি শুনেছি, এরূপ কাজ আর আমার দ্বারা হবে না।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেনঃ

তুমি কি চাও যে, তোমাকে আমি এমন একটি সূরার কথা বলি যার মতো কোন সূরাহ্ তাওরাত, ইনজীল এবং কুর'আনেও নেই? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ অবশ্যই বলুন। তিনি বলেনঃ এখান থেকেই যাওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে তা বলে দিবো।' তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাত ধরে চলতে চলতে অন্য কথা বলতে থাকেন, আর আমি ধীর গতিতে চলতে থাকি। এই ভয়ে যে না জানি কথা বলা থেকে যায়, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়ীতে পৌঁছে যান। অবশেষে দরজার নিকট পৌঁছে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেই।' তিনি বললেনঃ 'সালাতে কি পাঠ করো? আমি উম্মুল কুরা' পাঠ করে শুনিয়ে দেই। তিনি বললেনঃ

'সেই মহান আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এরূপ কোন সূরাহ্ তাওরাত, ইনজীল, যাবুরের মধ্যে নেই যা কুর'আনে রয়েছে। এটাই হলো 'সাব'আ' মাসানী। (মুসনাদ আহমাদ ২/৪১২, জামি' তিরমিযী ৮/২৮৩, মুসতাদরাক হাকিম ১/৫৬০। হাদীস সহীহ)

জামি'উত তিরমিযীতে আরো একটু বেশি বর্ণিত আছে। তা হলো এই যেঃ 'এটাই মহাগ্রন্থ আল কুর'আন যা আমাকে দান করা হয়েছে।' এই হাদীসটির সংজ্ঞা ও পরিভাষা অনুযায়ী হাসান ও সহীহ। আনাস (রাঃ) থেকেও এ অধ্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মুসনাদ আহমাদেও এভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে পরিভাষার প্রেক্ষিতে হাসান গারীব বলে থাকেন।

মুসনাদ আহমাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গমন করি। সে সময় সবেমাত্র তিনি শৌচক্রিয়া সম্পাদন করেছেন। আমি তিনবার সালাম দেই, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। তিনি বাড়ীর মধ্যেই চলে গেলেন। আমি দুঃখিত ও মর্মাহত অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করি। অল্পক্ষণ পরেই পবিত্র হয়ে তিনি আগমন করেন এবং তিনবার সালামের জবাব দেন। তারপর বলেন, 'হে 'আবদুল্লাহ ইবনু জাবির! জেনে রেখো, সম্পূর্ণ কুর'আনের মধ্যে সর্বোত্তম সূরাহ্ হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ সূরাহটি। (মুসনাদ আহমাদ ৪/১৭৭, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক - ১/৮৪) এর সনদ খুব চমৎকার। এর বর্ণনাকারী ইবনু 'আকীলের হাদীস বড় বড় ইমামগণ বর্ণনা করে

থাকেন। ইবনুল জাওজী (রহঃ)-এর মতে, এখানে 'আবদুল্লাহ ইবনু জাবির বলতে আবদী সাহাবীকে বুঝানো হয়েছে। আর হাফিয ইবনু 'আসাকির (রহঃ)-এর মতে, ইনি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু জাবির আনসারী বিয়াযী (রাঃ)।

আল কুর'আনের আয়াত, সূরাহ এবং সেগুলোর পারস্পরিক মর্যাদা

উপর্যুক্ত হাদীস এবং এর অনুরূপ অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ বের করে ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াইহ, আবূ বাকর ইবনু 'আরবী, হাফিয ইবনু হাযার (রহঃ)-সহ অধিকাংশ 'আলিমগণ বলেছেন যে, কোন কোন আয়াত এবং কোন কোন সূরাহ কিছু আয়াত ও সূরাহ অপেক্ষা বেশি মর্যাদার অধিকারী। আবার কারো কারো মতে মহান আল্লাহর কালাম সবই সমান। একটির ওপর অন্যটির প্রধান্য দিলে যে সমস্যার সৃষ্টি হবে তা হলো অন্য আয়াত ও সূরাহগুলো কম মর্যাদা সম্পন্ন রূপে পরিগণিত হবে। অথচ মহান আল্লাহর সব কথাই সমমর্যাদাপূর্ণ। (কুরতুবী আশ'আরী হতে তিনি আবূ বাকর বাকিল্লানী হতে তিনি আবূ হাতিম ইবনু হিব্বান বূসতী হতে তিনি আবূ হিব্বান এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে এ রকমই বর্ণনা করেছেন) ইমাম মালিক (রহঃ) হতেও এমন হাদীস বর্ণিত আছে।

সূরাহ্ ফাতিহার মর্যাদার ব্যাপারে উপরোল্লিখিত হাদীসমূহ ছাড়াও আরো হাদীস রয়েছে। সহীহুল বুখারীতে 'ফাযায়িলুল কুর'আন' অধ্যায়ে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'একবার আমরা সফরে ছিলাম। এক স্থানে আমরা অবতরণ করি। হঠাৎ একটি দাসী এসে বললোঃ 'এ এলাকার গোত্রের নেতাকে সাপে কেটেছে। আমাদের লোকেরা এখন সবাই অনুপস্থিত। ঝাড় ফুঁক দিতে পারে এমন কেউ আপনাদের মধ্যে আছে কি? আমাদের মধ্য থেকে একটি লোক তার সাথে গেলো। সে যে ঝাড় ফুঁক জানতো তা আমরা জানতাম না। সেখানে গিয়ে সে কিছু ঝাড় ফুঁক করলো। মহান আল্লাহর অপার মহিমায় তৎক্ষণাৎ সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করলো। তারপর ত্রিশটি ছাগী দিলো এবং আমাদের আতিথেয়তার জন্য অনেক দুধও পাঠিয়ে দিলো। সে ফিরে এলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ 'তোমার কি এ বিদ্যা জানা ছিলো? সে বললোঃ 'আমিতো শুধু সূরাহ্ ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছি।' আমরা বললামঃ তাহলে এ প্রাপ্ত মাল এখনই স্পর্শ করো না। প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করে নেই।' মাদীনায় এসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তিনি বললেনঃ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ.

'এটা যে ফুঁক দেয়ার সূরাহ্ তা সে কি করে জানলো? এ মাল ভাগ করো। আমার জন্যও এক ভাগ রেখো।' (ফাতহুল বারী ৪/৫২৯। সহীহুল বুখারী হাঃ ২২৭৬, ৫০০৭, ৫৭৩৬, ৫৭৪৯, সহীহ মুসলিম ৩৯/২৩, হাঃ ২২০১, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১১৩৯৯, আ.প্র. হাঃ ২১১৫, ই.ফা. হাঃ ২১৩২)

সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে আছে যে, একবার জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলেন, এমন সময় ওপর থেকে এক বিকট শব্দ এলো। জিবরাঈল (আঃ) ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতোপূর্বে কখনো খুলেনি। তারপর সেখান থেকে একজন ফিরিশতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেনঃ 'আপনি খুশি

হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হলো যা ইতোপূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। তা হলো সূরাহ্ ফাতিহা ও সূরাহ্ বাকারার শেষ আয়াতগুলো। এর একেকটি অক্ষরের ওপর নূর রয়েছে।' এটি সুনান নাসা'ঈর শব্দ।

সূরাহ্ ফাতিহা ও সালাত আদায় প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ

فَقِيلَ لأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ .ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - ثَلاَثًا - غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (ﷺ يَقُولُ (রাঃ) فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِى - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى - فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ). قَالَ هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ.

'যে ব্যক্তি সালাতে উম্মুল কুর'আন পড়লো না তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, পূর্ণ নয়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ 'আমরা যদি ইমামের পিছনে থাকি তাহলে? তিনি বললেনঃ 'তাহলেও চুপে পড়ে নিয়ো।' আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেনঃ 'মহান আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ 'আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে অর্ধ অর্ধ করে ভাগ করেছি এবং আমার বান্দা আমার কাছে যা চায় তা আমি তাকে দিয়ে থাকি। যখন বান্দা বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ

'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো।' বান্দা যখন বলে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমার বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করলো।' বান্দা যখন বলে, مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করলো। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেনঃ 'আমার বান্দা আমার ওপর সবকিছু সমর্পণ করলো।' যখন বান্দা বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের কথা এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা চাবে আমি তাকে তাই দিবো' তারপর বান্দা যখন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

'এসব আমার বান্দার জন্য এবং সে যা কিছু চাইলো তা সবই তার জন্য।' (সহীহ মুসলিম ১/২৯৬, সুনান নাসাঈ ৫/১১, ১২) কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় শব্দগুলোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুনান নাসাঈতে আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণিত, তার অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তা তার জন্যই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) পরিভাষা অনুযায়ী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু আবূ জার'আ একে সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমাদেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইবনু জারীরের এক বর্ণনায়

আছে যে, মহান আল্লাহ বলেন, ‘এটা আমার জন্য আর যা অবশিষ্ট আছে তা আমার বান্দার জন্য।’ অবশ্য এ হাদীসটি মূলনীতির পরিভাষা অনুসারে দুর্বল।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

এখন এই হাদীসের উপকারিতা ও লাভালাভ লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রথমতঃ এই হাদীসের মধ্যে সালাতের শব্দের সংযোজন রয়েছে এবং তার তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছে কিরা’আত। যেমন কুর’আনের মধ্যে অন্যান্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا﴾

তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; এই দু’য়ের মধ্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। (সহীহ মুসলিম ১/২৯৬, সুনান নাসাঈ ৫/১১, ১২) এর তাফসীরে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত। এখানে ‘সালাত’ শব্দের অর্থ হলো কিরা’আত বা কুর’আন পাঠ। (ফাতহুল বারী ৮/২৫৭) এভাবে উপরোক্ত হাদীসে কিরা’আতকে ‘সালাত’ বলা হয়েছে। এতে সালাতের মধ্যে কিরা’আতের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বিলক্ষণ জানা যাচ্ছে। আরো প্রকাশ থাকে যে, কিরা’আত সালাতের একটি বিরাট স্তম্ভ। এ জন্যই এককভাবে ‘ইবাদতের নাম নিয়ে এর একটি অংশ অর্থাৎ কিরা’আতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অপর পক্ষে এমনও হয়েছে যে, এককভাবে কিরা’আতের নাম নিয়ে তার অর্থ সালাত নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ

﴿وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴾

কারণ ফজরের কুর’আন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ। (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ৭৮) এখানে কুর’আনের ভাবার্থ হলো সালাত। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে,

وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ.

‘ফজরের সালাতের সময় রাত ও দিনের ফিরিশতাগণ একত্রিত হোন।’ (সহীহুল বুখারী, ৬২১, সহীহ মুসলিম – ১৫০৫, ফাতহুল বারী ৮/২৫১)

প্রতি রাক‘আতে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, সালাতে কিরা'আত পাঠ খুবই যরুরী এবং 'আলিমগণও এ বিষয়ে একমত।

দ্বিতীয়তঃ সালাতে সূরাহ ফাতিহা পড়াই যরুরী কি না এবং কুর'আনের মধ্যে হতে কোন কিছু পড়ে নিলেই যথেষ্ঠ কি-না এ ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও তার সহচরবৃন্দের মতে নির্ধারিতভাবে যে সূরাহ ফাতিহাই পড়তে হবে এটা যরুরী নয়। বরং কুর'আনের মধ্য হতে যা কিছু পড়ে নিবে তাই যথেষ্ঠ। তাঁর দালীল হলো- فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ "কুর'আনের যা সহজ তাই তোমরা পাঠ করো" (৭৩ নং সূরাহ আল মুয্যাম্মিল, আয়াত-২০) আয়াতটি।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাড়াতাড়ি সালাত আদায়কারী এক ব্যক্তিকে বললেনঃ

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাক্বীর বলবে। তারপর কুর'আন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে।" (সহীহুল বুখারী হাঃ ৭২৪, ৭৫৫, ৭৫৯, ৭৯৩, ৬২৫১, ৬২৫২, ৬৬৬৭ সহীহ মুসলিম ৪/১১, হাঃ ৩৯৭, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৯৬৪১; আ.প্র. হাঃ ৭১৩, ই.ফা. হাঃ ৭২১) তাদের দাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটিকে সূরাহ ফাতিহা নির্দিষ্টভাবে পড়ার কথা বললেন না বরং যে কোন কিছুই পড়াকে যথেষ্ঠ মনে করলেন।

দ্বিতীয় মত এই যে, সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা যরুরী এবং অপরিহার্য এবং তা পড়া ব্যতীত সালাত আদায় হয় না। অন্যান্য সকল ইমামের এটাই অভিমত। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-সহ তাঁদের ছাত্র এবং জামহূর 'আলিমগণের এটাই অভিমত। নিম্নের এই হাদীসটি তাঁদের দালীল যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ

'যে ব্যক্তি সালাত আদায় করলো, অথচ তাতে উম্মুল কুর'আন পাঠ করলো না, ঐ সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ; পূর্ণ নয়। (সহীহ মুসলিম ৯০৪, সুনান আবূ দাউদ, ৮২১, সুনান তিরমিযী, ৩১২, ২৯৫৩, মুসনাদ আহমাদ ২/২৫০, ৭৮৩২, ৯৯৩২, ১০৩১৯, ২৫০৯৯ সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭৮৪, ১৭৯৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৫১২। হাদীস সহীহ)

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

‘যে ব্যক্তি সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় না।’ (ফাতহুল বারী ২/২৭৬, সহীহ মুসলিম ১/২৯৫। [সহীহুল বুখারী হাঃ ১ম ১০৪ পৃষ্ঠা। জুযউল ক্বিরা’আত। সহীহ মুসলিম ১৬৯, ১৭০ পৃষ্ঠা। সুনান আবূ দাঊদ ১০১ পৃষ্ঠা। জামি‘ তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৭,৭১ পৃষ্ঠা। সুনান নাসাঈ ১৪৬ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৬১ পৃষ্ঠা। মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ ৯৫ পৃষ্ঠা। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১০৬ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা। সহীহ মুসলিম ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হাদীস নং ৭৫৮-৭৬৭ ও ৮২০-৮২৪। হাদীস শরীফ, মাওঃ ‘আবদুর রহীম, ২য় খণ্ড ১৯৩-১৯৬ পৃষ্ঠা, ইসলামিয়াত বি-এ. হাদীস পর্ব-১৪৪-১৬১ পৃষ্ঠা। হিদায়াহ দিরায়াহ ১০৬ পৃষ্ঠা। মিশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা। সহীহুল বুখারী হাঃ শায়খ ‘আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৪১। সহীহুল বুখারী হাঃ- আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭১২। সহীহুল বুখারী হাঃ- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭১৮। জামি‘ তিরমিযী- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪৭। মিশকাতুল মাসাবীহ- নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদ্রাসা পাঠ্য হাদীস নং ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৯৪। বুলূগুল মারাম ৮৩ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সা‘আদাত ১ম খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা।] সহীহ মুসলিম ৪/১১, হাঃ ৩৯৪, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ২২৮০৭; আ.প্র. হাঃ ৭১২, ই.ফা. হাঃ ৭২০)

সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইবনু হিব্বানে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ"

ঐ সালাত হয় না যার মধ্যে উম্মুল কুর’আন পড়া না হয়। (সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্, হাদীস নং ১/২৪৮, ও সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৩৯। তবে উম্মুল কিতাব এর স্থলে ফাতিহাতুল কিতাব এসেছে) এ ছাড়া আরো বহু হাদীস রয়েছে যা, প্রতি রাক‘আতে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি প্রমাণ করে। বিতর্কের বিষয় আলোচনা করলে আরো লম্বা হয়ে যাবে। আমরা শুধু তাদের বিতর্কের উৎসের দিকে ইঙ্গিত করেছি। (আমাদের দেশে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ভাইয়েরা ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করেন না, এটা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ‘আমলের পরিপন্থী। ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে অবশ্যই সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করতে হবে। মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা না পড়লে তার সালাত, সালাত বলে গণ্য হবে না। যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ

عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم إنا لنهذ هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن.

সহীহুল বুখারীর অন্য বর্ণনায় জুয'উল কিরা'আতের মধ্যে আছে 'আমর বিন শু'আইব তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন তোমরা কি আমার পিছনে কিছু পড়ে থাকো? তাঁরা বললেন যে, হ্যাঁ আমরা খুব তাড়াহুড়া করে পাঠ করে থাকি। তারপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন তোমরা উম্মুল কুর'আন অর্থাৎ সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত কিছুই পড়ো না)

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-সহ একদল বিদ্বানের মতে প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। আবার অন্যেরা বলেছেন, অধিকাংশ রাকা'আতে পড়া ওয়াজিব। আর হাসান বাসরী (রহঃ)-সহ অধিকাংশ বাসরীদের মত হলো- সালাতের কোন এক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পড়ে নেওয়া ওয়াজিব। কেননা হাদীসে মুতলাক তথা সাধারণভাবে সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) তাঁর অনসারীবৃন্দ, সুফইয়ান সাওরী ও আওযা'ঈ (রহঃ)-এর মতে, সূরাহ ফাতিহা পড়াই নির্দিষ্ট হবে না। বরং অন্য কিছু পড়লেও যথেষ্ট হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ "কুর'আনের যতোটুকু পড়া তোমার জন্য সহজ হয়, তুমি ততোটুকু পড়ো।" (৭৩ নং সূরাহ আল মুয্যাম্মিল, আয়াত ২০) যেমনটি পূর্বে আলোচনা হয়েছে। মহান আল্লাহ সঠিকটি ভালো জানেন। আর ইবনু মাজাতে বর্ণিত হয়েছে যে, لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها "যে ব্যক্তি ফরয ইত্যাদি সালাতে সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য সূরাহ পড়লো না তার সালাত হলো না। এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

উল্লেখ্য এসব বিস্তারিত আলোচনার জন্য শারী'আতের আহকামের বড় বড় গ্রন্থ থেকে রয়েছে। মহান আল্লাহ সঠিকটি ভালো জানেন।

তৃতীয়তঃ মুক্তাদীগণের সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে হবে কি-না এ ব্যাপারে 'আলিমগণ থেকে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

১. পূর্ববর্তী হাদীসসমূহের ব্যাপকতার কারণে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা মুক্তাদীগণের ওপর তেমনি ওয়াজিব যেমন ইমামের ওপর ওয়াজিব।

২. জেহেরী বা সিররী কোন সালাতেই সূরাহ ফাতিহা বা অন্য কোন সূরাহ কোনক্রমেই ওয়াজিব নয়। সূরাহ ফাতিহাও নয় এবং অন্য সূরাহও নয়। তাদের দালীল মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

‘যার জন্য ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরা’আতই তার ক্বিরা’আত’। (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৩/৩৩৯, বায়হাকী, ২/১৬০,১৬১, কিন্তু কোনটাই দুর্বলতা মুক্ত নয়। আল মাজমা‘, ২/১১১, আল আওসাত লিত তাবারানী, তবে উক্ত সনদে আবূ হারুন আল আবদী নামের একজন মাতরুক তথা বর্জনীয় রাবী আছে। এ ভাবে অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু সেগুলোর কোনটাই সহীহ না হওয়ার কারণে এবং রাবীগণ বিভিন্ন দোষে সমালোচিত হওয়ায় সবগুলো বর্ণনাই য‘ঈফ, যেমনটি ইমাম ইবনু কাসীরও বলেছেন) কিন্তু বর্ণনাটি হাদীসের পরিভাষায় একান্ত দুর্বল। যদিও হাদীসটির অন্যান্য সনদও রয়েছে, কিন্তু কোন সনদই অভ্রান্ত ও সঠিক নয়। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

যে সালাতে ইমাম নিরবে ক্বিরা’আত পড়েন, তাতে তো মুক্তাদির ওপর ক্বিরা’আত পাঠ ওয়াজিব, কিন্তু যে সালাতে উচ্চ স্বরে ক্বিরা’আত পড়া হয়, তাতে ওয়াজিব নয়। তাদের দালীল হচ্ছে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

অনুসরণ করার জন্য ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব যখন ইমাম তাকবীর বলে, তোমরা তাকবীর বলো। আর যখন ক্বিরা’আত পড়ে, তখন চুপ থাকো। (সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৬২, ৯৩২) এরূপই সুনান কিতাবের রচয়িতাগণও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে তিনি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আর যখন ক্বিরা’আত পড়ে, তখন চুপ থাকো। (সুনান আবূ দাউদ, জামি‘ তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ, হাদীস সহীহ) ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ (রহঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। অতএব উপরোক্ত হাদীসদ্বয় তৃতীয় এই মতটির বিশুদ্ধতার প্রতি প্রমাণ বহন করে। ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ)-এর দু’টি উক্তির পুরাতন উক্তি এটাই। ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

এসব মাসা’আলা এখানে বর্ণনা করার মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, সূরাহ ফাতিহার সাথে শারী‘আতের নির্দেশাবলীর যতোটা সম্পর্ক রয়েছে, অন্য কোন সূরার সাথে ততোটা নেই। মুসনাদ বাযযারে আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إذا وضعت جنبك على الفراش، وقرأت فاتحة الكتاب و قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فقد أمنت من كل شيء إلا الموت

যখন তোমরা বিছানায় শয়ন করো তখন যদি সূরাহ ফাতিহা এবং সূরাহ ইখলাস পড়ে নাও, তাহলে মৃত্যু ছাড়া প্রত্যেক জিনিস হতে নিরাপদ থাকবে। (মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৭৩৯৩। মাজমা‘উয যাওয়ায়িদ ১৭০৩০, কানযুল ‘উম্মাল ৪১২৬৯ হাদীস যঈফ)

ইসতি ‘আযাহ বা আ‘ঊযুবিল্লাহ প্রসঙ্গ

পবিত্র কুর’আনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ. وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّه سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

তুমি বিনয় ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ করো এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো। শায়তানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (৭ নং সূরাহ্ আ‘রাফ আয়াত নং ১৯৯-২০০) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেনঃ

﴿اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝ وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ﴾

মন্দের মুকাবিলা করো উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষে অবহিত। আর বলোঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শায়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিত হতে। (২৩ নং সূরাহ্ মু’মিনূন, আয়াত নং ৯৬-৯৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَه عَدَاوَةٌ كَاَنَّه وَلِىٌّ حَمِيْمٌ. وَ مَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَ مَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ. وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

মন্দকে প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শায়তানের কু-মন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৪১ নং সূরাহ্ হা-মীম সাজদাহ্, আয়াত নং ৩৪-৩৬)

এই মর্মে এই তিনটি আয়াত আছে এবং এই অর্থের অন্য কোন আয়াত নেই। আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মানুষের শত্রুতার সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো প্রতিদানে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করা। এরূপ করলে তারা তখন শত্রুতা করা থেকেই বিরত থাকবেন না, বরং অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হবে। আর শায়তানদের শত্রুতা হতে নিরাপত্তার জন্য মহান আল্লাহ তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে বলেন। কারণ সে মানুষের বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পায়। তার পুরাতন শত্রুতা আদম (আঃ)-এর সময় থেকেই অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেনঃ

﴿ يٰبَنِىۡۤ اٰدَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ الشَّيۡطٰنُ كَمَاۤ اَخۡرَجَ اَبَوَيۡكُمۡ مِّنَ الۡجَنَّةِ﴾

হে আদম সন্তান! শায়তান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে প্রলুব্ধ করে জান্নাত থেকে বহিস্কার করেছিলো। (৭ নং সূরাহ্ আ'রাফ, আয়াত নং ২৭)

অন্য স্থানে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿اِنَّ الشَّيۡطٰنَ لَكُمۡ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوۡهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدۡعُوۡا حِزۡبَهٗ لِيَكُوۡنُوۡا مِنۡ اَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ﴾

শায়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামের সাথী হয়। (৩৫ নং সূরাহ্ ফাতির, আয়াত নং ৬) , মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿اَفَتَتَّخِذُوۡنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗۤ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِىۡ وَ هُمۡ لَكُمۡ عَدُوٌّ ؕ بِئۡسَ لِلظّٰلِمِيۡنَ بَدَلًا﴾

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে কতো নিকৃষ্ট বদলা। (১৮ নং সূরাহ্ কাহফ, আয়াত নং ৫০) এতো সে শায়তান যে আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-কে বলেছিলোঃ 'আমি তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী।' তাহলে চিন্তার বিষয় এই যে, আমাদের সাথে তার চলাচলে কি হতে পারে? আমাদের জন্যই তো শপথ করে বলেছিলো। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغۡوِيَنَّهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ۙ اِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ الۡمُخۡلَصِيۡنَ﴾

সে বললোঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। এ জন্য মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَاِذَا قَرَاۡتَ الۡقُرۡاٰنَ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ. اِنَّه لَيۡسَ لَه سُلۡطٰنٌ عَلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَلٰى رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوۡنَ. اِنَّمَا سُلۡطٰنُه عَلَى الَّذِيۡنَ يَتَوَلَّوۡنَه وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ بِه مُشۡرِكُوۡنَ﴾

যখন তুমি কুর'আন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শায়তান থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে। তার কোন আধিপত্য নেই তাদের ওপর যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই ওপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা মহান আল্লাহর সাথে শরীক করে। ঈমানদারগণ ও প্রভুর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ওপর তার কোন ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা তো শুধু তাদের ওপরই রয়েছে যারা তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করে। (সূরাহ নাহল, আয়াত-৯৮-১০০)

কুর'আন তিলাওয়াত করার পূর্বে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

যখন তুমি কুর'আন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শায়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। (১৬ নং সূরাহ্ নাহল, আয়াত নং ৯৮)

ক্বারীদের একটি দল ও অন্যেরা উল্লিখিত আয়াতের ভিত্তিতে বলে থাকেন যে,

(১) কুর'আন পাঠের পর أَعُوذُ بِاللهِ পড়া কর্তব্য। এতে দু'টি উপকার আছেঃ

একঃ কুর'আনের বর্ণনারীতির ওপর 'আমল এবং দুইঃ 'ইবাদত শেষে অহঙ্কার দমন। আবুল হাতিম সিজিসতানী এবং ইবনু কালুকা হামযার এই নীতিই নকল করেছেন। যেমন আবুল কাসিম ইউসুফ ইবনু 'আলী ইবনু জানাদাহ (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'আল 'ইবাদাতুল কামিল' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকেও এটা বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীসের পরিভাষায় এর সনদ গারীব। ইমাম রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরের মধ্যে এটা নকল করেছেন এবং বলেছেন যে, ইবরাহীম নাখ'ঈ ও দাউদ যাহিরী (রহঃ)-এর এই অভিমত।

(২) ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মত হলো, 'সূরাহ ফাতিহার পর পাঠক أَعُوذُ بِاللهِ বলবে। (তাফসীরে কুরতুবী) তবে ইবনুল 'আরবী এই মতটিকে গারীব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(৩) ইমাম রাযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উভয় দালীলের ওপর 'আমলের উদ্দেশ্যে প্রথমে ও শেষে দুইবারই أَعُوذُ بِاللهِ পড়া কর্তব্য। (তাফসীরে কাবীর ১/৫৭, ৫৮)

(৪) জামহূর ‘উলামার প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, কুর’আন পাঠের পূর্বে আ‘ঊযুবিল্লাহ’ পাঠ করা উচিত, তাহলে কু-মন্ত্রনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সুতরাং ঐ ‘আলিমগণের নিকট আয়াতের অর্থ হচ্ছেঃ ‘যখন তুমি পড়বে’ অর্থাৎ তুমি পড়ার ইচ্ছা করবে।

যেমন নিম্নের আয়াতটিঃ ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ﴾

‘যখন তুমি সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াও।’ (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ৬)

তাহলে ওযূ করে নাও এর অর্থ হলোঃ ‘যখন তুমি সালাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করো।’ হাদীসগুলোর ধারা অনুসারেও এই অর্থটিই সঠিক বলে মনে হয়।

মুসনাদ আহমাদের হাদীসে আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সালাত আরম্ভ করতেন, অতঃপর

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

তিনবার পড়ে لَا إِلَهَ إِلَّا الله পড়তেন। তারপর পড়তেনঃ

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ ونَفْخِهِ ونَفْثِهِ.

চার সুনান গ্রন্থে এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এই অধ্যায়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস এটাই। (সুনান আবূ দাঊদ ১/৭৭৫, জামি‘ তিরমিযী, ২/২৪২, সুনান নাসাঈ ২/১৩২, ইবনু মাজাহ ১/৮০৭, মুসনাদ আহমাদ ১/৪০৩, ৪০৪, ৪/ ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৫, ৬/১৫৬, দারিমী ১/১২৩৯, । হাদীস সহীহ) هَمَزٌ শব্দের অর্থ হলো গলা টিপে ধরা, نَفَخٌ শব্দের অর্থ হলো অহঙ্কার এবং نَفَثٌ শব্দের অর্থ হলো কবিতা আবৃত্তি। ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) স্বীয় সুনানে এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। (সুনান ইবনু মাজাহ ১/২৬৫) আবূ দাঊদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে প্রবেশ করেই তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ কাবীরা’ তিনবার ‘আলহামদুলিল্লাহ কাসীরা’ এবং তিনবার ‘সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া ওয়াসিলাহ’ পাঠ করতেন। তারপর পড়তেন اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيْمِ مِنْ هَمْزه ونَفْخه ونفْثه। (সুনান আবূ দাঊদ ১/৪৮৬, ৭৪৮, হাদীস সহীহ)

সুনান ইবনু মাজায়ও অন্য সনদে এই হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। (সুনান ইবনু মাজাহ- হাদীস নং ১/৮০৮, হাদীস সহীহ)

মুসনাদ আহমাদের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনবার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ বলতেন। অতঃপর أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزه ونَفْخه ونفْثه পড়তেন। (মুসনাদ আহমাদ, ৫/২৫৩)

রাগান্বিত হলে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে

মুসনাদ আবি ই'য়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে দু'টি লোকের ঝগড়া বেধে যায়। ক্রোধে একজনের নাসাবন্ধ ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 'লোকটি যদি أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে নেয়, তাহলে তার ক্রোধ এখনই ঠাণ্ডা ও স্তিমিত হয়ে যাবে।' ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় কিতাব أَلْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ-এর মধ্যেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস সহীহ। পৃষ্ঠা নং ৩০৬/৩৯১। সুনান আবূ দাউদ ৪/৪৭৮০, জামি'উত তিরমিযী ৫/৩৪৫২, আল ইয়াওমু ওয়াল লাইল, পৃষ্ঠা ৩০৬, হাদীস ৩০৯, মুসনাদ আহমাদ ৫/২৪০, ২৪৪)

মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাউদ এবং জামি'উত তিরমিযীর মধ্যেও হাদীসটি রয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় এটাও আছে যে, মু'আয (রাঃ) লোকটাকে তা পড়তে বলেন, কিন্তু সে তা পড়তে অস্বীকার করলো এবং ক্রোধ পর্যায়ক্রমে বাড়তেই থাকলো। (সুনান আবূ দাউদ ৪/৪৭৮০, জামি'উত তিরমিযী ৫/৩৪৫২, আল ইয়াওমু ওয়াল লাইল, পৃষ্ঠা ৩০৬, হাঃ ৩০৯, মুসনাদ আহমাদ ৫/২৪০, ২৪৪। হাদীস য'ঈফ। য'ঈফ আবূ দাউদ হাঃ ৪১৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এই বৃদ্ধিযুক্ত অংশটি মুরসাল। অর্থাৎ 'আব্দুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-এর সাক্ষাত পায়নি। কারণ তিনি হিজরী ২০ সালের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন। তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে, হয়তো 'আব্দুর রহমান তা উবাই ইবনু কা'বের কাছে শুনেছেন। তিনিও এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী এবং তিনি তা মু'আয পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। কেননা, এঘটনার সময় বহু সাহাবী জীবিত ছিলেন।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, সুলাইমান ইবনু সূরাহ বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আমরা উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় দুই লোক তর্ক করছিলো। তাদের একজন অপরজনকে গালাগালি করছিলো এবং রাগে তার মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেনঃ আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা এখন উচ্চারণ করে তাহলে তার রাগান্বিত অবস্থা চলে যাবে। তা হলো আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম বলা। তখন ঐ লোককে অন্যরা বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তা কি তুমি শুনতে পাওনি? লোকটি বললোঃ আমি পাগল নই। (সহীহুল বুখারী ৩১০৮, ৫৭০১, ৫৭৬৪, সহীহ মুসলিম ৪/১০৯, ১১০, ২০১৫, ৬৪১৩, সুনান আবূ দাউদ ৪/৪৭৮১, সুনান নাসাঈ ১০২৩৩, আল ইয়াওমু ওয়াল লাইল, পৃষ্ঠা ৩০৭। তাফসীর

তাবারী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৭, হাঃ ১৩৯) সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ এবং সুনান নাসাঈতেও বিভিন্ন সনদে এবং বিভিন্ন শব্দে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো হাদীস রয়েছে। এ সবের বর্ণনার জন্য যিকর, ওযীফা এবং 'আমলের বহু কিতাব রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, জিবরাইল (আঃ) সর্বপ্রথম যখন প্রত্যাদেশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করেন তখন প্রথমে أَعُوْذُ بِاللهِ পড়ার নির্দেশ দেন। তাফসীরে ইবনু জারীরে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথম দফায় জিবরাইল (আঃ) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ওয়াহী এনে বলেন, أَعُوْذُ بِاللهِ পড়–ন। তিনি أَسْتَعِيْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করেন। জিবরাইল (আঃ) পুনরায় বলেন, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করুন। তারপর বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অর্থাৎ পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (তাফসীর তাবারী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৭, হাঃ ১৩৯। হাদীস যঈফ, যেমনটি লেখক বলেছেন)

'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এটাই সর্বপ্রথম সূরাহ যা মহান আল্লাহ জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ করেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব এবং এর সনদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। শুধু জেনে রাখার জন্যই এটা বর্ণনা করলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

আ'উযুবিল্লাহ পড়ার হুকুম

জামহূর 'উলামার হতে 'ইসতি'আযা' বা আ'উযুবিল্লাহ' পড়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। সুতরাং তা না পড়লে পাপ হবে না। 'আতা ইবনু আবী রিবাহ (রহঃ)-এর অভিমত এই যে, কুর'আন পাঠের সময় আ'ঊযুবিল্লাহ পড়া ওয়াজিব, তা সালাতের মধ্যেই হোক বা সালাতের বাইরেই হোক। ইমাম রাযী (রহঃ) এই কথাটি নকল করেছেন। 'আতার (রহঃ) কথার দালীল-প্রমাণ হলো আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলো। কেননা এতে فَاسْتَعِذْ শব্দটি 'আমর' বা নির্দেশ সূচক ক্রিয়াপদ। ঠিক তদ্রুপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সদা সর্বদা এর ওপর 'আমলও তা অবশ্য করণীয় হওয়ার দালীল। এর দ্বারা শায়তানের দুষ্টমি ও দুস্কৃতি দূর হয় এবং তা দূর করাও এক রূপ ওয়াজিব। আর যা দ্বারা ওয়াজিব পূর্ণ হয় সেটাও ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। আশ্রয় প্রার্থনা অধিক সতর্কতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং অবশ্যকরণীয় কাজের এটাও একটা মাধ্যম। কতিপয় বিদ্বান এটাও বলেন যে, আউযুবিল্লাহ পাঠ কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপরই ওয়াজিব ছিলো, তাঁর উম্মাতের ওপর ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক (রহঃ) হতে এটাও বণনা আছে যে, ফরয সালাতের নয় বরং রামাযান মাসের প্রথম রাতের সালাতে 'আউযুবিল্লাহ' পড়া উচিত।

মাস'আলাহঃ

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'ইমলা'র মধ্যে লেখেছেন যে, أَعُوْذُ بِاللهِ উচ্চস্বরে পড়তে হবে। তবে আস্তেও পড়া যেতে পারে।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) স্বীয় 'কিতাবুল উম্ম' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এটাও লেখেছেন যে, সশব্দে ও নিরবে উভয়ভাবেই পড়ার অধিকার আছে। কারণ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে ধীরে পড়ার এবং আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে উচ্চস্বরে পড়ার উক্তি সাব্যস্ত আছে। প্রথম রাকা'আতে আউযুবিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথমটি মুস্তাহাব হওয়ার এবং দ্বিতীয়টি মুস্তাহাব না হওয়ার। প্রধান্য দ্বিতীয় মতের ওপরই রয়েছে। মহান আল্লাহই সঠিক ও সুষ্ট জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) ও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট শুধু أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়াই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়তে হবে। আবার কেউ কেউ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَمِيْعُ العَلِيْمُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়তে হবে। সাওরী ও আওযা'ঈ (রহঃ)-এর মাযহাব এটাই। কেউ কেউ বলেন যে, أَسْتَعِيْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়তে হবে। তাহলে আয়াতের সবগুলো শব্দের ওপর 'আমলের পাশা পাশি 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের হাদীসের ওপরও 'আমল হয়ে যাবে। একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যেসব বিশুদ্ধ হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঐ গুলোই অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মতে সালাতের মধ্যে 'আ'উযু বিল্লাহ' পড়া হয় তিলাওয়াতের জন্য।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সালাতের জন্য পাঠ করা হয়। সুতরাং মুক্তাদিরও পড়ে নেয়া উচিত যদিও সে ক্বিরা'আত পড়ে না। 'ঈদের সালাতেও প্রথম তাকবীরের পর পড়ে নেয়া কর্তব্য।

জামহূর 'উলামার মতে 'ঈদের সালাতে সমস্ত তাকবীর বলার পর 'আ'উযু বিল্লাহ' পড়তে হবে। তারপর ক্বিরা'আত পড়তে হবে।

আ'ঊযুবিল্লাহ বলার গুরুত্ব ও ফাযীলত

আ'ঊযুবিল্লাহির মধ্যে রয়েছে বিষ্ময়কর উপকার ও মাহাত্ম্য। অহেতুক কথা বলার ফলে মুখে যে অপবিত্রতা আসে তা বিদূরিত হয়। ঠিক তদ্রুপ এর দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁর ব্যাপক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয়। আর আধ্যাত্মিক ও প্রকাশ্য শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় দুর্বলতা ও অপারগতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়। কেননা মানুষ শত্রুর মুকাবিলা করা যায়। অনুগ্রহ ও

সদ্ব্যবহার দ্বারা তার শত্রুতা দূরা করা যায়। যেমন পবিত্র কুর’আনে ঐ আয়াতগুলোতে রয়েছে যেগুলো ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অন্য জায়গায়া আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন যে,

﴿اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا﴾

নিশ্চয়ই আমার গোলামদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোমার রাব্বই যথেষ্ট। (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ৬৫) যে মুসলিম কাফিরের হাতে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি শহীদ হোন। যে সেই গোপনীয় শত্রু শায়তানের হাতে মারা পড়ে সে মহান আল্লাহর দরবার থেকে বহিস্কৃত, বিতাড়িত হবে। মুসলিমের ওপর কাফিররা জয়যুক্ত হলে মুসলিম প্রতিদান পেয়ে থাকেন। কিন্তু যার ওপর শায়তান জয়যুক্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। শায়তান মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ শায়তানকে দেখতে পায় না বলে কুর’আনুল কারীমের শিক্ষা হলোঃ ‘তোমরা তার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো যিনি শায়তানকে দেখতে পান, কিন্ত সে তাঁকে দেখতে পায় না।

আ‘ঊযুবিল্লাহ পাঠের নিগূঢ় তত্ব

আ‘ঊযুবিল্লাহ পড়া হলো মহান আল্লাহর নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা করা এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া। عِيَاذُه-এর অর্থ হলো অনিষ্টতা দূর করা, আর أَيَاذُه -এর অর্থ হলো মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করা। এর প্রমাণ হিসেবে মুতানাব্বির এই কবিতাটি প্রণিধানযোগ্যঃ

يَا مَنْ أَلُوْذُ بِهِ فِيْمَا أُؤَمِّلُهُ ... وَمَنْ أَعُوْذُ بِهِ مِمَّنْ أُحَاذِرُهُ

لَا يُجْبَرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ ... وَلَا يَهِيْضُوْنَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرَهُ

হে সেই পবিত সত্তা! যে সত্তার সাথে সাথে আমার সমুদয় আশা ভরসা বিজড়িত হয়েছে। আর হে সেই পালনকর্তা! যার নিকট আমি সমস্ত অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। যা তিনি ভেঙ্গে দেন তা কেউ জোড়া দিতে পারে না। আর যা তিনি জোড়া দেন তা কেউ ভাঙ্গতে পারে না।

‘আ‘ঊযু’ এর অর্থ হলো এই যে, আমি মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যেন বিতাড়িত শায়তান ইহজগতে ও পরজগতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে। যে নির্দেশাবলী পালনের জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি তা পালনে যেন আমি বিরত না হয়ে পড়ি। আবার যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন আমি না করি। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, শায়তানের অনিষ্টতা হতে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ব্যতীত আর কেউ রক্ষা করতে পারে না। এ জন্য বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ মানুষরূপী শায়তানের দুষ্কার্য ও অন্যায় থেকে নিরাপত্তা লাভ করার যে পন্থা শিখালেন তা হলো তাদের সাথে সদাচরণ। কিন্তু জ্বিন রূপী শায়তানের দুষ্টুমী ও দু®কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার যে উপায় তিনি বলে দিলেন তা হলো তাঁর স্মরণে আশ্রয় প্রার্থনা।

কেননা না তাকে ঘুষ দেয়া যায়, না তার সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে সে দুষ্টুমী হতে বিরত হয়। তার অনিষ্টতা হতে তো বাঁচাতে পারেন একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। প্রাথমিক তিনটি আয়াতে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সূরাহ্ আল আ'রাফে আছেঃ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ﴾

'তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ করো এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো।' (৭ নং সূরাহ্ আ'রাফ, আয়াত নং ১৯৯)

এটা হলো মানুষের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত। তারপর একই সূরায় মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّه سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

শায়তানের কু-মন্ত্রনা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (৭ নং সূরাহ্ আ'রাফ, আয়াত নং ২০০) সূরাহ্ মু'মিনে রয়েছেঃ

﴿اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ. وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ. وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ﴾

মন্দের মুকাবিলা করো উত্তম দ্বারা, তারা যদি বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বলোঃ হে আমার প্রভু! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শায়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (২৩ নং সূরাহ্ মু'মিনূন, আয়াত নং ৯৬-৯৮) অতঃপর মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ. اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَه عَدَاوَةٌ كَاَنَّه وَلِىٌّ حَمِيْمٌ. وَ مَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا١ۚ وَ مَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ. وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শায়তানের কু-মুন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে তিনি সর্বশ্রোত, সর্বজ্ঞ। (৪১ নং সূরাহ্ হা-মীম সাজদাহ, আয়াত নং ৩৪-৩৬)

শায়তান শব্দটির আভিধানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

‘আরবী ভাষার অভিধানে شَيْطَان শব্দটি شَطَنٌ থেকে বর্ণিত। এর আভিধানিক অর্থ হলো দূরত্ব। যেহেতু এই মারদুদ ও অভিশপ্ত শায়তান প্রকৃতগতভাবে মানব প্রকৃতি থেকে দূরে রয়েছে , বরং নিজের দু®কৃতির কারণে প্রত্যেক মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে দূরে আছে, তাই তাকে শায়তান বলা হয়। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা شَاطَ থেকে গঠিত হয়েছে। কেননা সে আগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং شَاطَ এর অর্থ এটাই। কেউ কেউ বলেন যে, অর্থের দিক দিয়ে দু’টোই ঠিক। কিন্তু প্রথমটিই বিশুদ্ধতর। ‘আরব কবিদের কবিতার মধ্যে এর সত্যতা প্রমাণিত হয় সর্বতোভাবে। সুলাইমান (আঃ)-কে যে শক্তি দেয়া হয়েছিলো তার উল্লেখ করে কবি উমাইয়া ইবনু আবী সালত বলেনঃ أيما شاطِنٍ عصاه عكاه ... ثمّ يُلْقى في السِّجْن والأغلال

কবি নাবেগা বলেনঃ نأت بسعاد عنك نَوًى شَطُونُ ... فبانت والفؤادُ بها رَهِينُ

সীবাওয়াইর উক্তি আছে যে, যখন কেউ শায়তানী কাজ করে তখন ‘আরবরা বলেঃ تشيطن فلان কিন্তু যদি شاط থেকে নির্গত হতো তাহলে বলতো تَشَيَّطَ। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ শব্দটি شَاطَ থেকে নয়, বরং شَطَنٌ হতেই নেয়া হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে দূরত্ব। কোন জ্বিন, মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী দুষ্টুমী করলে তাকে শায়তান বলা হয়। কুর’আনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ﴾

‘আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য বহু শায়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শায়তানের মধ্য থেকে এবং কতক জ্বিন শায়তানের মধ্য থেকে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলো মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণামূলক কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে।’ (৬ নং সূরাহ্ আন’আন, আয়াত নং ১১২)

মুসনাদ আহমাদে আবূ যার (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেনঃ

" يَا أَبَا ذَرٍّ، تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ "، فَقُلْتُ: أَوَ لِلْإِنْسِ شَيَاطِيْنُ؟ قَالَ: " نَعَمْ

‘হে আবূ যার! দানব ও মানব শায়তান হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।’ আমি বলি, মানুষের মধ্যেও কি শায়তান আছে? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ’ (মুসনাদ আহমাদ ৫/১৭৮, সুনান নাসাঈ ৮/৫৫২২, হাদীস যঈফ) সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

‘মহিলা, গাধা এবং কালো কুকুর সালাত নষ্ট করে দেয়।’ তিনি বলেন, হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! লাল, হলদে কুকুর হতে কালো কুকুরকে স্বতন্ত্র করার কারণ কি?’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘কালো কুকুর শায়তান।’ (সহীহ মুসলিম ১/ ২৬৫/৩৬৫, সুনান আবূ দাউদ ১/৯৫২, মুসনাদ আহমাদ ৫/ ১৪৯, ১৫১, ১৬০, ১৬১, হাদীস সহীহ)

যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ ‘উমার (রাঃ) একবার তুর্কী ঘোড়ার ওপরে আরোহণ করেন। ঘোড়াটি সগর্বে চলতে থাকে। ‘উমার (রাঃ) ঘোড়াটিকে মারপিটও করতে থাকেন। কিন্তু এর সদর্প চাল-চলন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি নেমে পড়েন এবং বলেনঃ ‘আমার আরোহণের জন্য তুমি কোন শায়তানকে ধরে এনেছো! আমার মনে অহঙ্কারের ভাব এসে গেছে। সুতরাং আমি এর পৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়াই ভালো মনে করলাম। (তাফসীর তাবারী ১/১১১)

‘রাজীম’ শব্দের অর্থ

رَجِيْم শব্দটি فَعِيْل-এর ওযনে اسم مَفْعُوْل-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে মারদূদ বা বিতাড়িত। অর্থাৎ প্রত্যেক মঙ্গল থেকে সে দূরে আছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ﴾

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং এগুলোকে করেছি শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (৬৭ নং সূরাহ্ মুলক, আয়াত নং ৫)

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ اِلْكَوَاكِبِۙ۶ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍۚ۷ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍۖۗ۸ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌۙ۹ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾

আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র রাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি। আর রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শায়তান থেকে। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শক্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (৩৭ নং সূরাহ্ সাফফাত, আয়াত নং ৬-১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَۙ۱۶ۙ وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍۙ۱۷ۙ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ﴾

আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং একে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করেছি। প্রত্যেক অভিশপ্ত শায়তান থেকে আমি একে রক্ষা করে থাকি। আর কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে এর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (১৫ নং সূরাহ্ হিজর, আয়াত নং ১৬-১৮) رَجِيْمٌ এর একটি অর্থ رَجْمٌ-ও করা হয়েছে। যেহেতু শায়তান মানুষকে কু-মন্ত্রণা এবং ভ্রান্তির দ্বারা রজম করে থাকে এজন্যে তাকে 'রাজীম' অর্থাৎ 'রাজিম' বলা হয়।

(সূরা ২য় ...)